১৯৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর শেখ মুজিবের জেলে থাকা অবস্থায় ফজিলাতুন নেছার তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে শেখ হাসিনার বিয়ে হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানটা একটু তড়িঘড়ি করে করেছিলেন ফজিলাতুন নেছা। কারণ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন তিনি এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরেনর চাপ আসতে ছিল। আকদ অনুষ্ঠান কেন তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে এ বিষয়ে এম এ ওয়াজেদ মিয়ার বইয়ে শেখ হাসিনার ভাষ্যমতে উল্লেখ পাওয়া যায়, “১৯৬৬ সালে আব্বা কর্তৃক ঘোষিত ঐতিহাসিক ৬ দফার প্রতি বিপুল জনসমর্থন দেখে গভর্নর মোনেম খাঁর সরকার তখন দেশের বিভিন্ন শহর-গঞ্জে আয়োজিত জনসভায় তিনি যাতে ভাষণ দিতে না পারেন সেজন্য তাকে পর পর বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার করতে থাকে এবং পরিশেষে তাকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখে।’’

‘‘এরপর পরিবারবর্গের ওপর শুরু করা হয় নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতন। শেখ ফজলুল হক মণিকেও অনির্দিষ্টকালের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে আব্বা-আম্মা চিন্তিত হয়ে আমার তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে এক সিএসপি-এর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে। ঐ সময় গভর্নর মোনেম খাঁন সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, আমাকে তাদের কেউ বিয়ে করলে তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা হতে পারে। এ কারণে ঐ ভদ্রলোকের পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়স্বজনও একটু ইতস্তত করছিলেন। তাছাড়া ভদ্রলোকের দাড়ি ছিল, যে কারণে ঐ প্রস্তাবে আমি বেশি খুশি ছিলাম না। অতঃপর ঐ বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হয়। আমার বিয়ে সম্পর্কিত ২য় প্রস্তাব আসে বিদেশ থেকে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ডিগ্রি নিয়ে সদ্য দেশে ফেরত আসা এক ভদ্রলোকের পরিবারের কাছ থেকে। ভদ্রলোকটি আমার চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো হওয়ায় আমি ঐ বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হইনি। এরপর আসে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব। তোমার উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হওয়ায় আমি বেশকিছু চিন্তা করে এতে রাজি হলাম। তাছাড়া তুমি একজন পরমাণু বিজ্ঞানী জেনে মনে মনে আমি বেশ খুশিও হয়েছিলাম।”

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বড় মেয়ের বিয়ের সকল দায়িত্ব নিজ থেকেই সম্পন্ন করেছিলেন ফজিলাতুন নেছা। আর কন্যা হিসেবে শেখ হাসিনা খুবই দুর্ভাগা ছিলেন, কারণ তার পৃথিবীতে আসার সময় আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন পিতা ও বিয়ের সময় প্রিয় বাবাকে কারাগারে থাকতে হয়েছে একমাত্র দেশমাতার টানেই। আবেগ, অনুভূতি আর স্নেহ ঘাটতির আক্ষেপে বড় হতে হয়েছে ফজিলাতুন নেছার ছেলেমেয়েদের। দেশমাতৃকার টানেই ছেলেমেয়েরাও বাবা-মায়ের সংগ্রামকে মেনে নিয়েছিলেন অবলীলায়।

শেখ হাসিনার বিয়ের সময় বঙ্গবন্ধু কারাগারে থাকায় অনাড়ম্বর পরিবেশে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অতিথিদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। ছেলে পক্ষ থেকেও স্বল্প সংখ্যক অতিথি বিয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ঘনিষ্ট ব্যক্তিত্ব এম এ আজিজ শেখ হাসিনার বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন অনেকটা অভিভাবক হিসেবে। বিয়েতে সামান্য বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়, পরে অবশ্য তা মীমাংসাও হয়। বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে এম এ আজিজ ওয়াজেদ মিয়াকে ডেকে বলেন, “বাবা তুমি চিন্তা করো না, তুমি তো সবই জানো, মেয়ের বাবা রয়েছে কারাগারে, তবে তোমার যথাযোগ্য সম্মান আমরা দেবো।” পরবর্তীতে আজিজ সাহেব চট্টগ্রামে এই দম্পতির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ড. ওয়াজেদকে নতুন মাজদা গাড়ি উপহার প্রদানের মাধ্যমে তার সুবিশাল মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিয়ের কিছুদিন পরেই এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে জেলগেটে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গবন্ধু ওয়াজেদ মিয়াকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করেন। শেখ হাসিনা ও ওয়াজেদ মিয়া দুইজনেই বঙ্গবন্ধুকে সালাম করেন এবং বঙ্গবন্ধু ওয়াজেদ মিয়াকে একটি রোলেক্স ঘড়ি পরিয়ে দেন। ঘড়িটির তখনকার বাজার মূল্য ছিল ১২০০ টাকা এবং ঘড়িটি ফজিলাতুন নেছা মুজিব নিজে কিনে কারাগারে নিয়ে যান এবং বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমে নতুন জামাইয়ের হাতে পরিয়ে দেন। এরপর বাসায় ফিরে আসেন সকলেই। বাসায় আসার পরে ফজিলাতুন নেছা ওয়াজেদ মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “বাবা তুমি তো বুঝতেই পারছো, মুরুব্বী বলতে এ বাসায় কেউ নেই। কামাল এখনো ছোট। তাছাড়া কোন আত্মীয়স্বজনও ভয়ে বাসায় বিশেষ একটা আসে না। তুমি আমার বড় ছেলের মতো। শেখ সাহেব অনুমতি দিয়েছেন যথাসম্ভব তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।” এক কথায় বলতে গেলে শেখ হাসিনার বিয়ের পুরো দায়দায়িত্ব পালন করেছেন ফজিলাতুন নেছা মুজিব। এমনিভাবে পরিবারের সকল কর্তব্যজনিত কর্ম একাই সামলাতেন ফজিলাতুন নেছা। পরিবার দেখা, কারাগারে থাকা স্বামীর খোঁজখবর রাখা, আন্দোলনকে বেগবান করা, অসহায় নেতাকর্মীদের সুখ-দুঃখে খোঁজখবর রাখা ইত্যাদি ছিল তার নিত্যদিনের কর্ম। এতকিছুর পরেও নিজের মধ্যে কখনো বিতৃষ্ণা নিয়ে আসেননি। উল্টো প্রবল উৎসাহে দেশের জন্য, দুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য সব কিছুকেই শক্ত হাতে মোকাবেলা করতেন।

পরিবারের অন্য ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিষয়ে ফজিলাতুন নেছা মুজিব অনবদ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। পরিবারের অন্য দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিয়ের পাকাপোক্তকরণে বঙ্গজননীর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। শেখ কামালের বিয়ে হয় দেশসেরা অ্যাথলেটিক সুলতানার সাথে আর শেখ জামালের বিয়ে হয় ফুফাতো বোন রোজীর সাথে। সেই বিয়ের সময় অনুষ্ঠানের চিত্রগুলোতে হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গজননীকে। বঙ্গজননী ছিলেন মাতৃকুলের শিরোমণি, মাতৃত্বের পুরো স্বাদ তিনি আস্বাদন করতে পেরেছিলেন।

সন্তানদের প্রত্যেকটি বিষয়ে বঙ্গবন্ধু আস্থার জায়গা খুঁজে পেয়েছিলেন, তাই জাতির জনক অনেকটা নির্ভার ছিলেন পারিবারিক বিষয়ে। তিনি রাজনৈতিক বিষয়কে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে বিবেচনায় নিয়েছিলেন, রাজনীতি ছিল বঙ্গবন্ধুর অস্থিমজ্জায়। বঙ্গজননী ছিলেন বাংলার/বাঙালির মায়েদের প্রতীক, সংসারের ঘানি টানতে টানতে তিনি কাজটাকে পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছিলেন, কখনোই ক্লান্তির লেশমাত্র বুঝতে দিতেন না কাউকেই, এমনকি নিজের ঘরের কেউই টের পেতেন না।